জেমস ক্যামেরন-এর অবতার: প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বিশ্বজয়

নাফিস আহমেদ খান

লেখক-পরিচালক জেমস ক্যামেরন-এর সাফল্যের ঝুলিটি নেহাত ছোট নয়। টারমিনেটর, ট্রু লাইজ, টোটাল রিকল, টাইটানিক এবং এখন অবতার। হলিউডের ইতিহাসের সবচেয়ে সেরা দুটো ব-ক বাস্টার ছবি টাইটানিক এবং অবতার-এর নির্মাতা তিনি, নিজের রেকর্ড হেলাফেলায় নিজেই ভাঙেন। টাইটানিক ছবির জন্য সেরা পরিচালকের অস্কার জেতার পর তিনি মঞ্চে উঠে বলেছিলেন: 'আই অ্যাম দ্য কিং অব দ্য ওয়ার্ল্ড'। অবতার মুক্তি পাওয়ার পর এখন আমাদেরও স্বীকার করতে হচ্ছে: আসলেই তিনি 'কিং অব দ্য ওয়ার্ল্ড'। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ১৮৫ কোটি ডলারেরও বেশি আয় করে টাইটানিকের সবচেয়ে লাভজনক ছবির রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছে অবতার, এগিয়ে যাচ্ছে আরো বড় বড় রেকর্ডের দিকে।

মুক্তির পরপরই সারা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছে অবতার। ছবিটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, হলিউডের ইতিহাসে যে কয়েকটি ছবি আধুনিক প্রযুক্তির ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে একটি এই অবতার। ক্যামেরন সবসময়ই প্রযুক্তির ভক্ত। অবতারে এমন সর্বাধুনিক প্রযুক্তি তিনি ব্যবহার করছেন যেটা এর আগে কোনো ছবি করেনি। হলিউডের ইতিহাস লিখিয়েরা অবতারের আগে এবং অবতারের পর - এভাবে যদি ভবিষ্যতে হলিউডি চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাস লেখেন তাহলে তাদের দোষ দেয়া যাবে না। কারণ চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এই ছবি।

সংক্ষেপে অবতার

'প্যানডোরা' নামে একটি অনিন্দ্য সুন্দর একটি দ্বীপ গ্রহকে অধিকার করার উদ্দেশ্য নিয়ে অবতার নামে একটি মিশন শুরু করে পৃথিবীবাসী। পৃথিবীর মানুষ প্যানডোরায় নিঃশ্বাস নিতে পারে না, ওখানে বাস করে নাভি নামের দশ ফুট লম্বা এক জাতি। ছবির প্রধান চরিত্র জ্যাক সালি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই যুক্ত হয় অবতার মিশনে। তাকে পরিণত করা হয় একজন নাভি অবতারে, যাতে প্যানডোরাতে গিয়ে সে নিঃশ্বাস নিতে ও নাভিদের সঙ্গে মিশতে পারে। প্যানডোরাতে গিয়ে নেইতিরি নামে এক নাভি মেয়ের প্রেমে পড়ে সালি। শুরু হয় অবতার মিশনের প্রতি তার দায়বদ্ধতা এবং নেইতিরিসহ নাভিদের প্রতি তার মমত্ববোধের মধ্যে টানাপোড়েন। এক সময় প্যানডোরাবাসীদের পক্ষ নিয়ে অবতার মিশনের সদস্যদের সঙ্গেই শুরু হয় সালির যুদ্ধ। শুরু হয় মরণপণ এক লড়াইয়ের, যা শেষ অব্দি ঠিক করে দেবে নাভি জাতির ভবিষ্যৎ।

অবতার ও প্রযুক্তি

ক্যামেরন অবতার প্রজেক্ট নিয়ে কাজ শুরু করেন ১৯৯৪ সালে, মানে আজ থেকে ১৬ বছর আগে! টাইটানিক নির্মাণ শেষ হবার পরই ১৯৯৯ সালে অবতারের কাজ শুরু হবার কথা ছিল, কিন্তু অবতারে যে ধরনের প্রযুক্তি দরকার সে ধরনের প্রযুক্তি সে সময় তৈরি হয়নি বলে এর কাজ পিছিয়ে দেন ক্যামেরন। ২০০৬-এর শুরুতে আবার নতুন করে অবতারের স্ক্রিপ্ট লেখেন ক্যামেরন। শুরু হয় নতুন ইতিহাস গড়ার পালা। আসুন পাঠক, এক নজরে দেখে নেয়া যাক, অবতার ছবিতে ক্যামেরন প্রধান প্রধান যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন সেগুলো:

সিজিআই-এর সাহায্যে পারফরমেন্স ক্যাপচার

অবতারের প্রতিটি অংশে Computer-Generated Imagery (CGI) প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করেছেন ক্যামেরন। এর আগেও 'টারমিনেটর টু: জাজমেন্ট ডে' এবং 'টোটাল

রিকল'-এর ছবি তৈরি করার সময় এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলেন তিনি তবে অবতারে ব্যবহার করেছেন "image-based facial performance capture" নামে একেবারে হাল আমলের প্রযুক্তি। অভিনয়ের সময় ক্যামেরা-সংযুক্ত বিশেষ হেডগিয়ার ব্যবহার করেছেন নায়ক নায়িকারা, তাঁদের মুখের ভাবভঙ্গি কম্পিউটারে তৈরি করা ভার্চুয়াল চরিত্রদের মুখে বসিয়ে দেয়া হচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গেই। ফলে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে চরিত্রগুলোকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

ডিজিটাল অ্যানিমেশন

গোটা ছবির প্রতিটি অ্যানিমেশন করেছে 'ওয়েটা ডিজিটাল' নামে নিউজিল্যান্ডের একটি কোম্পানি। প্রায় এক বছর ধরে ওয়েটা-র কর্মীরা ছবির পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিজিটাল অ্যানিমেশনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পাতা, এমনকি প্রতিটি পাথরকে আলাদা আলাদাভাবে রেন্ডার করা হয়েছে। এজন্য রেন্ডারিং, লাইটিং ও শেডিং-এর একেবারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এসব অ্যানিমেশন রাখার জন্য প্রায় ১ পেটাবাইট (১০০০ টেরাবাইট) পরিমাণ হার্ড ডিস্ক স্টোরেজ প্রয়োজন হয়েছে।

স্টেরিওস্কোপিক থ্রিডি ফিউশন ক্যামেরা সিস্টেম

থ্রিডি প্রযুক্তির প্রতি ক্যামেরনের অনুরাগ অনেক আগে থেকেই। ত্রিমাত্রিক প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করার জন্য সর্বকালের সবচেয়ে অগ্রসর ক্যামেরা সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে এ ছবিতে, যার নাম ফিউশন ক্যামেরা সিস্টেম। লাইভ অ্যাকশন দৃশ্য এবং কম্পিউটারে তৈরি করা দৃশ্যের মধ্যে যাতে বিন্দুমাত্রও কোনো গ্যাপ না থাকে সেটা নিশ্চিত করাই ছিল ফিউশন ক্যামেরার কাজ।

ভার্চুয়াল ক্যামেরা এবং সিমুল-ক্যাম

মোশন ক্যাপচারের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নাম সিমুল-ক্যাম ও ভার্চুয়াল ক্যামেরা। অবতারে এগুলোর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটেছে। অবতারের ভার্চুয়াল বিশ্বের ছবিকে বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করার জন্য ক্যামেরন মোশন-ক্যাপচারড রেজাল্টকে রিয়েল টাইম সেট আপে ধারণ করেছেন। সিজিআইভিত্তিক চরিত্র ও পরিবেশকে একটিমাত্র ফিউশন আইপিসে ধরা হয়েছে সিমুল-ক্যামের সাহায্যে। এর ফলে পরিচালক ক্যামেরায় চোখ রেখে সাধারণ লাইভ অ্যাকশন দৃশ্যের মত করেই দেখতে পেয়েছেন সিজিআইডি দৃশ্যগুলোও। ভার্চুয়াল ক্যামেরাটা এক্ষেত্রে ভার্চুয়াল মনিটর হিসেবে কাজ করেছে এবং ক্যামেরনকে সুযোগ করে দিয়েছে ছবিটির চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে সার্বিক ইফেক্টকে একবারে পর্যালোচনা করার।

এ ছবিতে সিজিআই এবং ত্রিমাত্রিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে গেছেন ক্যামেরন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মোশন-ক্যাপচার পোশাক পরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, যাতে সংযুক্ত ছিল বিশেষ সেন্সর, ফলে কম্পিউটারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাদের শরীরের প্রতিটি নড়াচড়াকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা। এ ছবির তৈরি করা হয়েছে বিশেষ হাই ডেফিনিশন থ্রিডি ক্যামেরা, অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখের মাত্র ২.৫ ইঞ্চি সামনে স্থাপন করা হয়েছিল দুটি সনি এইচডিসি-এফ৯৫০ হাই ডেফিনিশন ক্যামেরা, যাতে মুখের একটি পেশীর নড়াচড়াও ধারণ করা যায়। সত্যি, পরিচালক হিসেবে জেমস ক্যামেরনের তুলনা হয় না। আর তাঁর এই প্রযুক্তিপ্রীতির কারণেই অবতার চলচ্চিত্র শিল্পে গড়তে পেরেছে নতুন ইতিহাস। ■